এই প্রবাসে, এক চিলতে জানালার খোঁজে

শওগাত আলী সাগর *কানাডা থেকে*

কথাটা বলেছিলেন শেখর ই গোমেজ। তিনি বলছিলেন তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। টরন্টোয় প্রথম আসার পর নিজের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া হাঁসফাঁসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন, 'ঢাকায় আমার একবার জন্ডিস হয়েছিল। ডাক্তার বলে দিলেন টানা তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। যেই আমি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো মানুষ, তুমুল আড্ডায় হল্লা করে বেড়ানো মানুষ, সেই আমাকে যদি তিন মাস টানা ঘরে শুয়ে থাকতে বলা হয়, অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় আন্দাজ করে দেখুন।' তারপরই তিনি জানান দেন, এই টরন্টোতে পয়লা আসার পরও তার ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। এক চিলতে জানালার জন্য মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল তার , কিন্তু কিছুতেই সেই জানালাটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। টরন্টোতে আজ সেই জানালা হয়েছে, জানালাটা নিতান্তই বড় কিছু না হলেও একচিলতে নয় কিছুতেই। লেখক, শিল্পী সৈয়দ ইকবালের উপন্যাস 'পক্ষীজীবন'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বর্ষণসিক্ত একটি সন্ধ্যা কাটানোর পর এই আমিও যেন বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে উপলব্ধি করেছি, সত্যিই তো এই টরন্টোতেও দম আটকে যাওয়া আবদ্ধদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু জানালা খুলে যাচ্ছে। 'পক্ষীজীবনে'র প্রকাশনা উৎসবটিও ছিল সত্যিকার অর্থেই তেমন একটি খোলা জানালা উন্মোচন মাত্র।

সৈয়দ ইকবাল। নামটার সঙ্গে পরিচয় অনেক দিন থেকেই। শিশু সাহিত্য পড়তে গিয়ে এই নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। তত দিনে জেনে গিয়েছিলাম তিনি একজন আঁকিয়ে। ছবি আঁকেন। চিত্রশিল্পী। ঢাকায় খবরের কাগজে নাম দেখেছি, ছবি দেখেছি। ব্যস। অনেক দূরের অগণিত পাঠকের মতোই একজন আমি সৈয়দ ইকবালের কাছে। সেই সৈয়দ ইকবাল টরন্টোতেই থাকেন- এই কথাটা জেনে গিয়েছিলাম, টরন্টোতে এসেই। ফাঁক খুঁজছিলাম কখন তার সঙ্গে দেখা হবে।

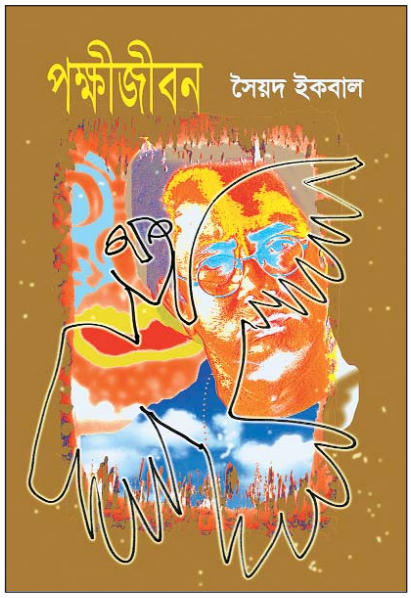

তা সত্ত্বেও এই প্রবাসে কেউ কেউ লিখছেন। বই বেরুচ্ছে, প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে। লেখক কবি ইকবাল হাসানদের মতো লেখকরা প্রতি বছর ঢাকায় বইমেলায় সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রবাসী লেখকদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাও কম কী...

এরই মাঝে বন্ধু ঋষিকেশ বৈদ্য জানান জয়ন্ত বণিক পত্রিকা করছেন। আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িককালের ছাত্র। জয়ন্ত'র সঙ্গে পত্রিকা নিয়ে নানা পরিকল্পনায় জেনে যাই সৈয়দ ইকবালও এই কাগজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। কাগজের আলোচনার সূত্র ধরেই দেখা হয়ে যায় সৈয়দ ইকবালের সঙ্গে। এক বিকেলে ডেনফোর্থে 'সাঁজে'র নিচে তার 'আস্তানায়' আড্ডা জমে যায় সৈয়দ ইকবালের সঙ্গে। বাংলা নিউজের নানা বিষয় নিয়ে আলাপে ঠিক হয় সৈয়দ ইকবাল নিয়মিত লিখবেন এই কাগজে। 'কি লিখবো আমি?- সৈয়দ ইকবালের প্রশ্ন। আশ্চর্য! বলে কি লোকটা? একজন শিল্পী, লেখক। সে কি না জিজ্ঞেস করে কি লিখবো আমি!

সৈয়দ ইকবালের 'বোহেমিয়ান' জীবন যাপন সম্পর্কে আমি ধারণা পেয়ে গিয়েছিলাম কয়েক আড্ডায়। টরন্টো প্রবাসী তিনি অনেক দিন ধরেই। মাঝেমধ্যে হুটহাট চলে যান বাংলাদেশে। একটা দীর্ঘ সময় ডুব দিয়েছিলেন মেক্সিকোতে। এমনিতেই তো একজন শিল্পীর জীবন থাকে নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। তার ওপর যার জীবন এমন বৈচিত্র্যময় তার আবার লেখার বিষয় নিয়ে চিন্তা। তাও যদি তিনি হন একজন সুলেখক। সৈয়দ ইকবালও স্বীকার করলেন, আমার জীবন তো পাখির জীবনের মতো, কেবল উড়ে উড়ে যাওয়া, এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে। আমরা বললাম, এই নিয়েই হোক আপনার নিয়মিত কলাম। এক পাখি তার উড়ালজীবনে যা দেখলো, যা ভাবলো, যা বুঝলো তাই বলে যাবে পাঠকদের জন্য। সেটিই হবে লেখার বিষয়বস্তু। আলাপচারিতার ফাঁকে হঠাৎ জয়ন্ত ক্যামেরার ফোকাস ফেলে শিল্পীর ওপর। কাঁধে থাকা গামছাটি মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ডিজাইন শিল্পী বিবি রাসেলের ডিজাইন করা তাঁরই দেওয়া উপহার তাঁতের গামছাটি মাথায় বেঁধে জয়ন্ত ছবি তুলে ফেলে। ঠিক হয় এই ছবিটি ব্যবহার করেই ছাপা হবে সৈয়দ ইকবালের নিয়মিত কলাম।

কিন্তু কলামের নাম হবে কী? পাখির জীবন? পাখির উড়াল? পাখির মতো যেই জীবন? নানা প্রস্তাব বেরোতে লাগলো শিল্পীর মুখ থেকে। আচ্ছা 'পক্ষীজীবন' কেমন হয়? 'পক্ষীজীবন' নামটা ছোট্ট একটি মূর্ছনা তোলে কানে। সিদ্ধান্ত হয়ে, এটাই হবে সৈয়দ ইকবালের কলামের শিরোনাম। এভাবেই শুরু পক্ষ জীবনের বয়ান। পক্ষীটি আর কেউ নয়, স্বয়ং লেখক, শিল্পী। কাহিনীর শুরু এই টরন্টোয়। পিয়ারসন এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা। গন্তব্য বাংলাদেশ। পথে জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে যাত্রাবিরতি। সেই বিরতিতে তিলোত্তমা নামের এক রমণীয় রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। শুরু হয়ে যায় পক্ষীজীবনের জীবনগাথা। সেই জীবনগাথায় উঠে আসে এপার বাংলা, ওপার বাংলা, বাংলাদেশ, কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতি, জীবনবোধ। আসে টরন্টোয় প্রবাসী বাঙালিদের কথাও। পাল্টে যাওয়া পারিপার্শ্বিকতা। বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তিত জীবনালেখ্য। বাংলা নিউজের নিয়মিত কলাম সেই পক্ষীজীবন শেষ পর্যন্ত

বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পীর নিজের আঁকা প্রচ্ছদ দিয়ে বইটি প্রকাশ করেছে ঢাকার এডর্ণ পাবলিশার্স। ঢাকায় প্রকাশিত হলেও সম্প্রতি টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হলো বইটির প্রকাশনা উৎসব।

টরন্টোতে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু প্রকাশনা উৎসবের কথা তেমন একটা শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। গত মাসে টরন্টোর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অনন্ত আহমদের কবিতার বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের খবর পত্রিকায় পড়ে আমোদ বোধ করেছিলাম। বাহ১ টরন্টোতে এসবও হচ্ছে। পক্ষীজীবনের প্রকাশনা উৎসবে গিয়ে নতুন কিছু অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

টরন্টোতে বাংলা বইয়ের একটি দোকান আছে- অন্যমেলা। সাদি ভাই ভর্তুকি দিয়ে দোকানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চয় একদিন প্রবাসী বাঙালিরা বই কিনবে, বই পড়বে- এমন একটি স্বপ্ন নিয়ে। অন্যমেলা'য় আমি প্রায়শই বিকেল, সন্ধ্যা কাটাই। এখানে আড্ডা জমে সংস্কৃতিমনা কিছু মানুষের। টরন্টোয় বইয়ের পাঠক-ক্রেতাদের অবস্থা দেখে দুঃখ পাওয়াটাকেই নিয়তি ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রকাশনা উৎসবে লোকসমাগম দেখে সেই দুঃখবোধটা চাপা পড়ে সেখানে নতুন একটি আশা সঞ্চার হয়েছে। বই প্রেমিক মানুষের সংখ্যা তাহলে নিতান্তই কম নয় এই প্রবাসে।

প্রকাশনা উৎসবে বলতে গিয়ে লেখক মাহমুদুল খান, সাংবাদিক জসিম মল্লিক বলছিলেন, প্রবাসে লেখালেখি কতোটা কঠিন। প্রথমত এখানে জীবিকার সন্ধানে অহরহই দৌড়াতে হয়। প্রবাসে 'টাইম ইজ মানি'- সময়কে মাপা হয় ডলার দিয়ে। মাহমুদুলের মতে, কেউ লিখছেন এই কথা শুনলে প্রথমেই মানুষের মধ্যে যে প্রশ্নটি জাগে সেটি হচ্ছে, লেখালেখি করে 'মাল' পাওয়া যায়? 'মাল' না পাওয়া গেলে লিখে কী লাভ? আর যদি বই বেরোয় তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করেন, চলছে কেমন? এই চলার মানে পাঠক কি রকম নিচ্ছে বইটি তা নয়, বরং 'মাল' কেমন আসছে সেই অর্থে।

তা সত্ত্বেও এই প্রবাসে কেউ কেউ লিখছেন। বই বেরুচ্ছে, প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে। লেখক কবি ইকবাল হাসানদের মতো লেখকরা প্রতি বছর ঢাকায় বইমেলায় সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রবাসী লেখকদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাও কম কী? আশা জাগানিয়া এই খবরগুলোই কিন্তু আমাদের কাছে এক ঝটকা মুক্ত হাওয়ার মতো প্রবাসের ক্লান্তি দূর করে সজীব করে তোলে।

সৈয়দ ইকবালও বলছিলেন, এই প্রবাসে তাঁকেও একটি পেশায় নিয়োজিত হতে হয়েছে জীবিকার জন্যই। সেই পেশার বিশ্রামহীনতার ফাঁকেও তার লেখক সত্তা ভেতর থেকে কাতুকুতু দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছে, নাড়িয়ে দেয়। অবকাশের খোঁজে থাকতে হয় সেই কাতুকুতুর জবাব দিতে। তবু সৈয়দ ইকবাল লিখছেন, ভবিষ্যতেও লিখে যাবেন এই স্বপ্ন যেমন তার আছে, আমাদেরও আছে সেই প্রত্যাশা।

আসলে লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বদেশের টান, মায়া। কথাটা বলছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ। এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষ্য, লেখালেখি হচ্ছে সৃজনশীলতা। প্রবাসে কেন, সব জায়গাতেই লেখালেখি একটি কঠিন কাজ। সাহিত্য সৃষ্টিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে অন্তরে স্বদেশের উপস্থিতি। দেশে যারা থাকেন তারা ভেতরে বাইরে দেশকে নিয়েই থাকেন। ফলে তাদের লেখালেখির চর্চাটা হয় অনেকাংশে সহজতর। কিন্তু প্রবাসে যারা থাকেন তাদের অন্তরে স্বদেশ আরো উজ্জ্বল থাকলেও তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই বাধে যেই দেশটিতে তিনি বসবাস করছেন সেই দেশের পরিবেশ, সংস্কৃতি। সর্বোপরি জীবিকার তাগিদ। অন্তরে বাংলাদেশের সবুজ ধারণ করে আছেন বলেই প্রবাসে বসে সৈয়দ ইকবালরা লিখতে পারছেন, হয়তো আরো পারবেন।

'পূর্বের চোখ পশ্চিমের মন'-এর লেখক এরিক ইমদাদ একটি চমৎকার কথা বলেছেন এই প্রকাশনা উৎসবে। তার বইটির প্রকাশনাও হয় এই অনুষ্ঠানেই। তিনি বলছিলেন, কলকাতা যখন বেড়াতে যেতাম তখন মনে হতো এই কলকাতা শহরটিকে আমি চিনি। এই শহরে সুনীল, বুদ্ধদেব, শক্তিরা থাকেন। কিন্তু টরন্টোতে যখন আসি তখন আমার বারবার মনে হচ্ছিল, এই শহরটি আমার চেনা নয়। এই শহরে কেউ আমার পরিচিতজন নেই। না, এরিক ইমদাদ কোনো স্বজন বন্ধুদের কথা বলেননি। তার অনেক বন্ধুবান্ধব, স্বজন আছেন এই শহরে। যারা তাকে গাড়িতে করে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন টরন্টো শহরকে দেখতে এবং দেখাতে। যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে তার উপন্যাস 'পূর্বের চোখ পশ্চিমের মন'। তিনি বলছিলেন কোনো লেখকের কথা, কোনো বইয়ের কথা। বাংলাদেশ থেকে নতুন আসা কোনো অভিবাসী বা পর্যটক টরন্টোয় যাচ্ছি শুনলেই যেন বলে উঠতে পারেন- ওই শহরে অমুক লেখক থাকেন। নিশ্চয়ই একদিন এই প্রবাসী বাঙালিদের মধ্য থেকেই এমন লেখক বেরিয়ে আসবেন, যিনি দাপটের সঙ্গে কাঁপিয়ে বেড়াবেন বাংলাদেশের পাঠকগোষ্ঠীকেও। যখন আমরাও বলতে পারবো, টরন্টো হচ্ছে অমুকের শহর। এটি কি খুব আকাশ কুসুম স্বপ্ন হয়ে গেলো? হলেও বা ক্ষতি কী? আপাতত এক চিলতে জানালা হলেও তো আমরা পাচ্ছি, যেখানে বুকভরে শ্বাস নেওয়া যায়।